সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর উপন্যাস: 'আত্মপ্রকাশ'

মঞ্জুভাষ মিত্র

'আত্মপ্রকাশ' স্বীকারোক্তির ভঙ্গিতে রচিত আত্মজৈবনিক উপন্যাস, কিন্তু এই উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে আত্মজীবনকে প্রকাশ করেছেন সেখানে বাস্তবের সঙ্গে শিল্পসম্মতভাবে বুনে দিয়েছেন স্বপ্ন ও কল্পনাকে। লেখক হিসেবে এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। বই আকারে কম-বেশি একশো চল্লিশ পাতার এই উপন্যাসটি হালকা ঝকঝকে গদ্যে লেখা, ভিতরে ভিতরে অসংখ্য কবিতার অবয়ব ও গঠন অথচ উপন্যাসশিল্পের প্রধান নিয়মগুলো বইটি কোনোভাবেই লঙ্ঘন করেনি। বস্তুত এমন একটি বই পড়বার পর লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় ও তাঁকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ তরুণ কবিকে পূজাসংখ্যায় একটি উপন্যাস লিখতে বলেছিলেন এবং সেই অলৌকিক আদেশেই (না কি অনুরোধ?) বাংলা সাহিত্যে অন্যতম দিকনির্ণয়ী উপন্যাসটির জন্ম হল। বীট কবিদের গোষ্ঠীপতি জন কেরুয়াক নিজে কবিতার পাশাপাশি উপন্যাস লিখেছিলেন এবং সুনীল যখন আইওয়াতে গিয়েছিলেন, কেরুয়াকের সঙ্গে আমেরিকাতে তাঁর সাক্ষাৎও হয়েছিল। কথাপ্রসঙ্গে উপন্যাস কীভাবে শুরু করতে হয় এ-সম্বন্ধে আমেরিকান লেখক বাঙালি নবীন লেখককে কিছু বলেছিলেন। 'আত্মপ্রকাশ' লেখা শুরু করার সময় সেই কথাগুলো তাঁর মনে ছিল এ-কথা ঔপন্যাসিক স্বয়ং কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন।

'আত্মপ্রকাশ'-এর প্রকাশকাল ১৯৬৬। এই উপন্যাসটিকে অনুভব করার জন্য একে সমরেশ বসু-র 'বিবর' এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর 'ঘুণপোকা' উপন্যাসদুটির পাশাপাশি পড়া যেতে পারে। অন্যদিকে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে কাফকা-র 'The Castle' ও 'The Trial', জাঁ পল সার্ত্র-এর 'Nausea', আলবেয়ার কাম্যু-র 'The Stranger' বা 'The Outsider', জেমস জয়েস-এর 'Dubliners' অথবা আমেরিকান সাহিত্যে সল বেলো-র 'Dangling Man' প্রভৃতি উপন্যাসের সঙ্গে 'আত্মপ্রকাশ'-এর তুলনা করলে বাংলা উপন্যাসটিকে কিছুটা জেনে বুঝে নিতে সুবিধা হয়। অন্যদিকে 'আত্মপ্রকাশ'-এর লেখকরূপী যে নায়ক 'আত্ম'-র গভীরে ডুব দিয়েছে, মরমী কবির মতো নিজেকে আত্মবিশ্লেষণের শেষপ্রান্তে নিয়ে গেছে, তার মুখশ্রীকে সম্পূর্ণ দেখবার জন্য ফ্রয়েডীয় সাইকো-অ্যানালিসিস তত্ত্বেরও কিছুটা শরণ নিতে হবে। ফ্রয়েডীয় স্বপ্নব্যাখ্যা ও লিবিডো-প্রসঙ্গ অনেকটাই পথ দেখাবে। সর্বোপরি পুনশ্চ পাঠ করতে হবে নগরজীবনের বীরগাথার যাঁরা কবি ও 'আত্ম'-র যারা রূপকার সেই বোদলেয়ার-র‍্যাবোঁ-এলিয়ট প্রভৃতির রচনাবলি। উপন্যাসকারের পরবর্তীকালে রচিত

স্মৃতির শহর কাব্যগ্রন্থটিও দেখে নিতে হবে কারণ এই উপন্যাসটি শুধুমাত্র মানুষী প্রেমের উপন্যাস নয়, কলকাতা প্রেমেরও উপন্যাস—এক মহৎ কল্পনাবিদের প্রথম আত্ম-উন্মোচনের মায়াবী কাহিনি। এসব প্রসঙ্গে অবশ্যই ধীরে ধীরে যথা সময়ে আসব।

'আত্মপ্রকাশ' আধুনিক উপন্যাস এবং বিংশ শতাব্দীর আখ্যান। এর অন্তর্লগ্ন আধুনিকতাকে জানতে গেলে বিংশ-শতকীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক-দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষিত অথবা পটভূমিকে মনে রাখতে হবে। সাহিত্যে আধুনিকতার সর্বাত্মক উন্নতি ঘটে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানিতে হিটলার ও ইতালিতে মুসোলিনি মানুষের বিরুদ্ধে এক ধ্বংসাত্মক ঘৃণার অভিযান শুরু করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ১৯৪৫-এ স্টালিনগ্রাডে মিত্রশক্তির কাছে জার্মানির আত্মসমর্পণ ঘটে। স্যর উইনস্টন চার্চিল তাঁর *The Second World War* নামক ছয় খণ্ডে সমাপ্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সম্পর্কিত বিশালায়তন অতুলনীয় ইতিহাসগ্রন্থের পরিশেষে লিখেছেন, 'Germany has collapsed, Europe must be re-built'—জার্মানির পতন ঘটল, ইয়োরোপকে এবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। প্রতীকী ঢঙে বলা যায়, বিংশ শতকের, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাসে পাশাপাশি ধ্বংস ও নির্মাণের এক যুগল ক্রিয়া আমরা লক্ষ করি।

বিংশ শতকের আধুনিক সাহিত্যের মূলে আছে মহাযুদ্ধের অভিঘাত। বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে ছিন্নমূল ও গৃহহারা করে পৃথিবীর স্থানে-অস্থানে ছড়িয়ে দিল, প্রকট হল মানুষই মানুষের প্রধান ব্যাহতকারী এবং রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্মনীতি নিয়ন্ত্রিত সমাজের তলদেশস্থিত বিশাল চোরাবালি আবিষ্কৃত হল। একই অনুষঙ্গে যুক্ত হতে পারে বঙ্গজীবনে স্বাধীনতাকালীন দেশভাগ যা একটা ট্র্যাজিক বেদনাময় পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসে এই ইঙ্গিত আছে।

> পাকিস্তান হবার পর, দেশ ছেড়ে আমরা কলকাতায় না এসে বহরমপুরে এসেছিলুম বলে আমাদের গায়ে ঠিক রিফিউজির গন্ধ লাগে নি। দাদামশাই বহরমপুরে আগেই শিক্ষকতা করতেন, বাবাকেও ওখানকার স্কুলে একটা কাজ জুটিয়ে দিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সকলের সঙ্গে মিশে গেলুম। আমার তিন দিদিই বেশ সুন্দরী বলে স্থানীয় লোকের কৌতূহল ও সহানুভূতি পেতে দেরি হয় নি।

এখান একটু ভিন্নভাবে রয়েছে লেখকের আত্মজীবনের উপাদান।

যে-মানুষ ছিন্নমূল ও অনিকেত, সে দিশাহারাভাবে তার শিকড়কে নতুন ভূমিতে সংসক্ত করতে চাইছে, 'আত্মপ্রকাশ'-এর নায়কের মধ্যে এই জাতীয় ছাপ আছে। এ

একটা বেঁচে থাকার লড়াই, ডারউইন যে যোগ্যতমের উদ্বর্তন বা 'Survival of the fittest'-এর কথা বলেছিলেন তার কথাও মনে পড়ে যায়। বুকের ভিতর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, সফলতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উপন্যাসের যুবক নায়ক যে কথা বলেছিল অথবা ভেবেছিল তা উদ্ধৃত করছি—

> আমি নিজের জন্য একটা যুক্তি ঠিক করে নিয়েছিলুম। বাড়িঘর ছেড়ে এসে নিজেকে একলা বোধ হতো, তখন আরও মনে পড়তো, আমি শুধু বাড়িঘর বা বাবা-মাকেই ছেড়ে আসি নি, আমি আরও অনেক কিছু ছেড়েছি। যে জায়গায় আমি জন্মেছিলাম, তাও আমাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। আমাদের গ্রামের পাশে ছিল দুর্দান্ত আড়িয়াল খাঁ নদী—চিরকালের মতো সেই নদীটা আমি হারিয়েছি, বাড়ির ঠিক পাশেই ছিল বুড়ো বাতাবি লেবুর গাছ—সেটাকেও হারিয়েছি এ-জন্মের মতো, টিয়া-ঠুঁটি আমগাছটার নিচে আর কখনো ছুটে যাবো না কালবৈশাখীর ঝড়ে, শ্মশানখোলার বটগাছে আর শুনবো না সেই তক্ষকের ডাক, বাঁশের সাঁকোর ওপর বসে নিচের ঘূর্ণি জলে খলসে আর বাঁশপাতা মাছের খেলা দেখা, আদিগন্ত এক বুক সমান সেই পাটক্ষেতের মধ্যে আমার কৈশোরের একা ঘুরে বেড়ানো—সেখানে আর কোনোদিন ফিরে যাবার উপায় নেই। শুধু বাবা-মাকে ছেড়ে আসাই নয়, চিরজীবনের জন্য একটা নদী বা একটা প্রান্তরকে হারাবার দুঃখও কম নয়। বহরমপুরে থাকতে তেমন মনে পড়ে নি, কিন্তু কলকাতায় এসেই আমার প্রবলভাবে মনে পড়েছিল জন্মভূমির গ্রামের কথা, খেজুর রসের গন্ধ আর জলের স্রোতের শব্দ। সেসব হারাবার দুঃখেই আমি যেন একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক কিছু হারাতে হারাতে মানুষ এমন একটা জায়গায় আসে, যখন তাকে হারাবার নেশায় পেয়ে বসে। আমিও ঠিক করেছিলাম, আমি সবকিছু হারিয়ে ফেলবো—ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, বিশ্বাস-অবিশ্বাস। নতুন জায়গায় যখন একা নিজেকে বাঁচতে হবে—তখন আমি বাঁচবো আমার নিজের তৈরি করা নিয়মে, নিজের পছন্দমতো ভালো-মন্দ নিয়ে। গোড়া থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে একটা গোটা মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। এইসব ভাবতুম আর কি।
>
> আরও একটা ভালো যুক্তি ছিল। আমি এই শহরে আগন্তুক, কিন্তু আমাকে যেন কেউ গাঁয়ের ছেলে বলে চিনতে না পারে—সেটাও দেখতে হবে। আমাকে নিরীহ বোকা ভেবে এই শহর যাতে আমাকে পিষে না মেরে ফেলে তাও লক্ষ রাখা দরকার। আক্রমণটা কোন্‌দিক থেকে আসবে তা জানি না, তাই তন্নতন্ন করে এ শহরকে আমি চিনতে চেয়েছিলাম।

এখানেই পাচ্ছি আধুনিক সাহিত্যে কবি-সাহিত্যিকের alienation বা নৈঃসঙ্গের তত্ত্ব। এই মানুষ সমাজের অনেকের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ ও একা, কারুর সঙ্গে নিজেকে

মেলাতে না-পারা সে জন্মবিদ্রোহী। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে—মহাযুদ্ধ, রক্ত ও ক্লান্তি পার হয়ে আসা বিচূর্ণিত মানুষের তত্ত্ব দেখা গেল উপন্যাস-সাহিত্যে; ভাবগত ও আঙ্গিকগত ক্ষেত্রে তাই লেখক বিশেষভাবে অনুশীলন করেন বিচ্ছিন্নতা ও অসংলগ্নতার। তাঁরা বলতে চাইলেন, সহজ সরল সমগ্রতা ও প্রাঞ্জল সুবোধ্যতার সময়টাই এখন আর নেই; সময় যেহেতু ব্যাধিগ্রস্ত ও গোলমেলে অতএব তার প্রভাব ব্যক্তির মানসেও পড়বেই। যুদ্ধ-দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সমকালীন পৃথিবীর সভ্য আবরণের তলে তলে বর্বর শক্তিসমূহের উদ্‌ঘাটন দেখাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, অনুরূপ সংখ্যক মানুষ বোমা-বর্ষণেও প্রাণ দিয়েছে অকালে। সুতরাং মানুষের ভালোত্বে আস্থাস্থাপনকারী জীবনবিশ্বাস, যা ছিল পরম আশাবাদী তা এক তীব্র হতাশার আবর্তে পড়ে ভাষা হারাল। দুঃখ-মৃত্যু-নিষ্ঠুরতার বিকল্প পথগুলি আদরণীয় হয়ে উঠল, এ-যেন বিষ দিয়ে বিষক্ষয়ের চেষ্টা এবং এভাবেই উপন্যাসে এবং সাহিত্যে সত্তার বিদ্রোহের জন্ম হল।

এই সমাজবিবিক্তির বোধ ও সত্তার বিদ্রোহের স্ফুরণ 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসের পাতায় পাতায়। কিছুটা আত্মজৈবনিক এই উপন্যাসের নায়ক যে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো নয় তা প্রথম থেকেই বোঝা যায়। সে সমাজের ভিতরে থেকেও যেন সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও নিরালম্ব—জীবনানন্দের ভাষায় বলা যায়, নিজেরই মুদ্রাদোষে সে যেন অপর সকলের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আসলে এই মানুষ শিল্পী, এই মানুষ অতিমানব—তার হৃদয় জলের মতো একা একা ঘুরে ঘুরে কথা কয়। 'আত্মপ্রকাশ'-এর একেবারে প্রথম পৃষ্ঠা থেকে উদাহরণ দিচ্ছি—

> তখনও দ্বিতীয় কাপ চা খাওয়া হয় নি। খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে বারবার ভুলে যাচ্ছি। চোখ দুটো আঠার মতন। ... এই তো এইটুকু সময়, সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে ন'টা, এর মধ্যে খুব একা গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে, খুব ইচ্ছে করে চেয়ার, খাট, বইয়ের আলমারি ও ঘুরন্ত পাখা সমেত নিজেকে ভালবাসতে।

অতঃপর ৪১ পাতায়—

> আক্রমণটা কোন্‌দিক থেকে আসবে তা জানি না, তাই তন্নতন্ন করে এ শহরকে আমি চিনতে চেয়েছিলাম। ... নিউ আলিপুর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে আসতুম খালাসীটোলায় দিশি মদের দোকানে—সেখানে মেথরের পাশে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেব, ঠেলাওয়ালার পাশে মধ্যবয়েসী শিল্পী ও পকেটমার, এদের সঙ্গে সমান হয়ে বসে থেকেছি।

এই নায়ককে একই সঙ্গে বিদ্রোহী, আত্মমগ্ন এবং কাব্যিক বলে চিনে নিতে ভুল হয় না। এক কথায় বলতে পারি 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসে শিল্পী-সাহিত্যিকের এই

বিদ্রোহ যা সমাজের চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম নিগড় থেকে শতহস্ত ব্যবধানে অবস্থান করতে চায় এবং এভাবেই মানুষের মৌলিক অধিকারকে নিরন্তর অনুসরণ করে তার চমৎকার বিবৃতি পাওয়া যায়। এখানে যেন নিহিত রয়েছে 'কৃত্তিবাস' কবিতা আন্দোলনের ঘনীভূত এক পৃষ্ঠা।

> কিন্তু এসব যুক্তির ভুল আমি ক্রমশ বুঝতে পারি। ... খুব একটা ধনীর বাড়িতে সফিসটিকেটেড পরিবারের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলে কী রকম একটা অস্বস্তি হয়... কিন্তু মদের দোকানে, জুয়ার আড্ডায়, তুতি কিংবা বীণার ঘরে, মল্লিকবাজারে, হাওড়া ব্রিজের নিচে কোথাও কোনো কৃত্রিমতা বা আড়ষ্টতা নেই, অনায়াসে টেবিলের ওপর পা তুলে বসা যায়, গরম লাগলে জামা খুলে ফেলা যায় যে-কোনো সময়ে, জোরে কথা বলছি না আস্তে, কখন হাসবো— তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই, মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক থাকতে পারায় একটা আরাম পাই ওসব জায়গায়।

সভ্যতার বাইরে এসে সমাজের বাইরে এসে এই যে মুক্তির নিশ্বাস ফেলা, এই ভাবটা 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসে খুব আছে। এই বইয়ে 'আত্ম'-র ভিতর anguish বা তীব্র বেদনাবহনের পাশাপাশি আছে সারা পৃথিবীকে জয় করে নেওয়ার মতো, সর্বাত্মক আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য এক দুর্মর প্রতিজ্ঞা।

আখ্যানটির আরো একটি বৈশিষ্ট্য, প্রথম থেকেই কালোর পাশাপাশি আলোকেও স্বীকার করে নেওয়া, তাকে উদারভাবে ব্যবহার করা। শুরুতেই এ-কাহিনির নায়কের স্বেচ্ছাকৃত সযত্নরচিত জীবনযাপনের গোপন ক্ষয়ের রঞ্জনা লেগে অপঘাতে নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

> কোনো দরকার ছিল না, তবু বোধহয় মারার ঝোঁকেই বারীনদা আমাকে আবার মারলো চোয়ালে। খুব জোর নয়, তবু বুঝতে পারলুম, থুতনির কাছে কেটে গেছে, মাটিতে এক ফোঁটা রক্ত দেখে মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

এইসব অংশে বিদ্রোহ, সুরা, গণিকা, এলএসডি, দুঃস্বপ্ন, অসুখ ইত্যাদির বাতাবরণ রয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত এ-উপন্যাসকে উন্মোচনের, বিদ্রোহ থেকে সৃষ্টিতে, সংশয়ের অন্ধকার থেকে আত্মপ্রকাশের আলোয় আসবার ইতিহাস বলা যায়। মূলত নারীর প্রতি প্রেম এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসাই এই উত্তরণের হেতু। মানুষ অর্থাৎ মানুষ ও তার সমস্ত কিছু নিয়েই এ-পৃথিবী।

> আমি নানারকম ভুল ভাঙতে ভাঙতে আরও নতুন নতুন ভুলের মধ্যে প্রবেশ করি। বেশ ভালো লাগে। বেঁচে থাকার মধ্যে ক্রমশই বেশি করে সুখ পাচ্ছি আজকাল। একটা কমলালেবু কিংবা চিনেবাদাম খেতে গিয়ে মনে হয়, এদেরও প্রাণ আছে, ফিসফিস করে ওরা বলে যায় আমাদের প্রাণ দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে

রাখছি, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। না, অকৃতজ্ঞ হই নি, পৃথিবীর যাতে একটুও আঘাত না লাগে, এমন সন্তর্পণে মাটিতে পা ফেলি এখন।

এবং—

যমুনার হাসিটা খুব অন্যরকম সুন্দর লাগলো, আমিও সুন্দরভাবে হাসলুম। সেই রকম করেই জিজ্ঞেস করলুম, যমুনা, আমি কি রকম আছি, তুমি জিজ্ঞেস করলে না? যমুনা বললো, আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়, আপনি ভালো আছেন।

'আত্মপ্রকাশ'-এর এই উপসংহার পূর্ব অনুচ্ছেদে ব্যক্ত বর্তমান প্রবন্ধ-রচয়িতার অভিমতটিকেই সমর্থন করে।

উপন্যাসের প্রথম বাক্যটিই গুরুত্বপূর্ণ। একে বলা যায় প্রারম্ভবিন্দু। হালকা ও ঝকঝকে ভাবে শুরু হলেও প্রতিনিয়ত কথ্যভাষার শক্তি অনুভব করা যায়—

সকালবেলা পরিতোষ এসে বললো, এসব আপনারা কি আরম্ভ করেছেন? সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত!

শেখর বাড়ি ফেরেনি, তার ভাই ইকনমিক্স-এর ছাত্র পরিতোষ দাদার বন্ধুর কাছে এই অভিযোগ করছে। মা ভয়ানক চিন্তিত। এভাবে সূচনাতেই পাঠকের কৌতূহল সজাগ হয়ে ওঠে। নবীন লেখকের নীরব বিদ্রোহ যে সমাজেরই বিরুদ্ধে, আভাসে ইঙ্গিতে তা বেশ বোঝা যায়।

শুনে আমার খুব অস্বস্তি হলো। সকালবেলাতেই কেন অপরের সমস্যা আসবে আমার কাছে! ... বুঝতে পারি জলের অপর নাম জীবন, মানুষ পৃথিবীতে বড় সুখে আছে। খুবই ইচ্ছে করে, পরিতোষ যা খুশি বলে যাক্, আমি গোপনে অন্যমনস্ক থাকি...।

কথনভঙ্গি একই সঙ্গে হালকা ও গম্ভীর। রাতের মদ্যপানের পর সকালে জলের স্বাদ ভারি মিষ্টি লাগে, লেখকের এই বলার স্টাইলটাও অনবদ্য। মনে পড়ে যায় টি. এস. এলিয়টের 'Four Quartets'-এর সেই অমোঘ পঙ্‌ক্তি—

... human kind
Cannot bear very much reality...
('Four Quartets')

এই আখ্যানে বাস্তবকে খুব একটা সহ্য করতে না-পারা মানুষের পাশাপাশি পাওয়া যায় আধুনিকতার মর্মবাণী, নিঃসঙ্গতার এক শৈল্পিক সম্ভাবনা।

সুনীলদা, জীবন নিয়ে আপনারা যে-রকম খেলা করছেন, তার সত্যিই কতটা মূল্য আছে আমার সন্দেহ হয়।

পরিতোষের এই উক্তি স্বল্প পরিসরে অনেক কথাই বলে। বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা যাকে জীবন নিয়ে খেলা বলেন, কল্পনাপ্রবণ মানুষের কাছে তা জীবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, 'আত্মপ্রকাশ'-এর নায়ক, তার বন্ধুবর্গের মধ্যেও এমনটাই ছিল। মনে পড়ে যায় *একা এবং কয়েকজন* কাব্যগ্রন্থের 'দুপুর' নামক কবিতার অমোঘ পঙ্‌ক্তিদ্বয়—

> এর চেয়ে রাত্রি ভালো, যুবকটি মনে মনে বললো বারবার
> রোদ্দুর মহৎ করে মন, আমি চাই শুধু ক্লান্ত অন্ধকার।

এই উপন্যাসে স্বেচ্ছাকৃত ও পরীক্ষামূলকভাবে এই অন্ধকারের রাজ্যে ভ্রমণের ইতিহাস আছে কিন্তু আলোকই যে অনুসন্ধান-অভীষ্ট তা শেষে এসে বোঝা যায়।

অফিস করা বা দৈনন্দিন রুটিন কাজকর্ম সম্বন্ধেও নায়কের মনোভাব ভারি চমৎকার। শৈল্পিক মেজাজের এক শাহরিক যুবার কাছে প্রেম ও কবিতা ছাড়া, মদ্যপান ও বন্ধুত্ব অথবা নৈঃসঙ্গের সুললিত চর্চা ছাড়া আর কোনো কাজ যে থাকতে পারে না, তা আমরা আধুনিক সাহিত্যের অনেক কবিলেখকের কাছ থেকেই শিখেছি। ছোটো ছোটো কথা বা বাক্যের তলদেশে থাকা humour অথবা কৌতুক, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, সরল স্বীকারোক্তি, নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তাকে খণ্ডন, এক কথায় নির্মোহ আত্মবিশ্লেষণ, এসব 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসে অনেক রয়েছে—

> এইসব বৃষ্টির দিনে সাধারণত অনেক লোকের অফিসে না-যাবার শখ হয়। কিন্তু আমার অফিসে যেতে বড় ভালো লাগে আজকাল, চৌকো টেবিলের সামনে পা তুলে দিয়ে চা খাবার যে আনন্দ, তার তুলনায় বাড়িতে খাটে শুয়ে থাকা কিছুই না। ... মানুষকে হুকুম করা কিংবা ধমকাবার মধ্যে যে মজা আছে তা আমি সদ্য পেতে শুরু করেছি।

একটিই উদাহরণ দিলাম মাত্র। আর বার্নার্ড শ তো অনেক আগেই বলে গেছেন, যে মানুষের যাওয়ার মতো কোনো অফিস নেই তার অবস্থা সত্যিই অসহনীয়।

'আত্মপ্রকাশ'-এর আখ্যানে মানুষ-সম্বন্ধে লেখকের কৌতূহল ও পর্যবেক্ষণ আছে। মি. মৈত্র অর্থাৎ বড়ো জামাইবাবু, যার দৌলতে অফিসে বিনা কাজের মাঝারি মাইনের চাকরি, রিসেপশন কাউন্টারের ইহুদি মেয়ে, কৈশোরকালের আদর্শ সঙ্গী দাদামশাই, জুয়ার ঠেকের মালিক বারীনদা, অবিনাশ, সুবিমল, শেখর, অরুণ, নুরুল ইত্যাদি বন্ধুবর্গ —এমনই বহু মানুষের চলচ্ছবি এ-উপন্যাস। বন্ধুদের সঙ্গে Camaraderie বা সহমর্মিতা এ-উপন্যাসের একটা মূল অবস্থান। এইসব বন্ধুবর্গের কেউ কেউ অবশ্য 'কৃত্তিবাস' কবিগোষ্ঠীর উদীয়মান কবি-লেখকদের আদলে নির্মিত। জীবনে টিকে থাকতে গেলে শুধু একা থাকার আর্ট আয়ত্ত করাই নয়, বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা বা friendly co-operation-এরও যে খুব দরকার 'আত্মপ্রকাশ' পড়লে বেশ বোঝা

যায়। এরিখ মারিয়া রেমার্কের 'তিনসঙ্গী' (ইংরেজি অনুবাদে Three Comrades) উপন্যাসের বন্ধুত্বের উজ্জ্বল চিত্রের মতোই এখানেও বন্ধুত্বের এক আলোকিত পৃথিবী রয়েছে। আসলে 'কৃত্তিবাস' মানে তো শুধুই কবিতার বিস্ফোরণ নয়, বন্ধুত্বেরও বিস্ফার। বাইবেলে তো বলেইছে, বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনের ওষধি। শেকসপিয়ার আবার 'As You Like It'-এ প্রায় উলটোটাই বলে গেছেন—

Most friendship is feigning, most loving mere folly.

অর্থাৎ, অধিকাংশ বন্ধুত্বই ভানমাত্র, অধিকাংশ ভালোবাসাই ভ্রান্তি। যা হোক 'আত্মপ্রকাশ' থেকে বন্ধুত্বের এক অপূর্ব চিত্র যা যুগপৎ কৌতুকময়ও বটে, তা পাঠক-পাঠিকাদের কিঞ্চিৎ উপহার দিচ্ছি—

> হাঁটতে হাঁটতে পার্ক স্ট্রিটে চলে এলাম। সে দোকানেও কারুকে চেনা পাওয়া গেল না। পার্ক স্ট্রিটের মুখে ফিরে এসে, আমরা ছ'জন বিষম চঞ্চল হয়ে উঠলুম। ... সুবিমল বললো, না, না, ওসব ঝামেলায় যাবার দরকার নেই। তার চেয়ে আয় ভিক্ষে করা যাক। ... ট্রাফিকের লাল আলোয় অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়েছে, সুবিমল সেদিকে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে একটা গাড়ির লোকদের সঙ্গে কি কথা বলতে লাগলো। একটু বাদেই হাসতে হাসতে হাত উঁচিয়ে ফিরে এলো, ওর হাতে পতাকার মতো উড়ছে একটা পাঁচ টাকার নোট।... তিনজন সত্যিকারের ভিখিরি চেহারার ভিখিরি পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে কাণ্ডকারখানা দেখছিল আমাদের। শেখর হাসতে হাসতে আমাদের ফান্ড থেকে তিনজনকেই একটা করে টাকা দিয়ে দিল।

বাস্তবিক 'কৃত্তিবাস'-এর বন্ধুরা পার্ক স্ট্রিটে রঙ্গচ্ছলে কোনো রাতে ভিক্ষে করে সত্যিই মদ খেয়েছিল এ-কথা জানা যায়। এ তো গেল অত্যাগসহন বন্ধুত্বের দিক। এবার নবীন নায়কের মেয়েদের প্রতি ভালোবাসার প্রসঙ্গে আসছি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর উত্তরাধিকার সরাসরি বর্তেছে। অর্থাৎ সাহিত্যে শিল্পরচনাই মুখ্য। অধিকন্তু 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক ও কবিদের প্রকাশের আলোয় আনতে সদা-উন্মুখ বুদ্ধদেব বসু, শব্দের পাশাপাশি নিজেকে মেয়েদের প্রেমিক বলেও ঘোষণা করেছিলেন।

বস্তুত 'আত্মপ্রকাশ'-এর অনেক আগে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কৃশকায় আত্মধর্মী উপন্যাস 'মৌলিনাথ' লিখে গিয়েছিলেন। 'মৌলিনাথ'-এ আত্মপ্রেম, নারীদের প্রতি ভালোবাসা ও কবিহৃদয়ের অনুপম বেদনার এক মহান ভাষ্য পাওয়া যায়। 'আত্মপ্রকাশ'-এও কবিলেখকের নারীদের প্রতি অপরূপ ভালোবাসা ও তার সঙ্গে মিশ্রিত হৃদয়ের বেদনাময় অনুভূতির কথা আছে।

এবার 'আত্মপ্রকাশ'-এর সেইসব নায়িকাদের কথা একটু বলছি—

ওদের মধ্যে একটি লাল শাড়ি পরা মেয়ের দিকে দু'তিনবার তাকিয়ে আমার চোখ আটকে গেল। মুহূর্তে মনে পড়লো সেই দৃশ্য, ওকে আমি দেখেছিলুম দু'বছর আগে। একটা বিয়েবাড়িতে বহু আলো ও লোকজন, তার মধ্যে আমি ঐ মেয়েটিকে, ওর নাম যমুনা, ওকে দেখেছিলাম। সেই দেখা আমার বুকে লেগে আছে। বিয়ের দিনে লোকজনের সট্‌সট্ ছোটাছুটি, সানাইয়ের চিৎকার আর গণ্ডগোলের সুর, বেমানান ঝলমলে পোশাকে অসংখ্য কুৎসিত নারী, তার মধ্যে আমি যমুনাকে দেখেছিলাম, এখনও সেই ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, বিশাল সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে ঐ বালিকাটি দাঁড়িয়েছিল, একটি সাদা ফ্রক পরা, হালকা শরীরে ঝক্‌ঝকে স্বাস্থ্য, আমি নিচ থেকে দেখছিলাম, মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে তলার মানুষদের দিকে তাকিয়েছিল। ওর চোখে কী রকম যেন একটা অবাক হবার ভাব ছিল, ঐ বয়েস, ঐ হাঁসের মতন শরীর, দেবীর মতন মুখের ডৌল, সাদা ধপধপে ফ্রক, ওর চোখের বিস্ময়—সব মিলিয়ে আমার মনে হয়েছিল যেন একটি সরলতার স্থির মূর্তি, যার কাছে পৃথিবীর সব কিছুই সুন্দর, যে নিজের শরীরের জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে সুন্দরের জেগে ওঠাকে দেখছে। সুন্দরী স্ত্রীলোক তো কম দেখি নি, কাছ থেকে, দূর থেকে, কখনো সাজানো, কখনো অনাড়ম্বর, এমন কি সেই বিয়েবাড়িতেও, যাদের ঠিক স্ত্রীলোক বলে—সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে শুধু যাদের শরীরই প্রকট, তাদেরও দেখছিলাম, কথা ও ফষ্টিনষ্টি করা হয়েছিল কম নয়, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি সরলতার জন্য হঠাৎ কাঙাল হয়ে পড়েছিলুম। আমার ইচ্ছে হয়েছিল ওকে দু'হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি, দেখি, ছুঁয়ে দিলে ওর গা থেকে রং উঠে আসে কিনা, সরল বিস্ময়ভরা জীবনের পবিত্র রং।

ও যে খুব সুন্দরী, তা নয়। অথবা, ঐ বয়সে সব মেয়েই আশ্চর্য সুন্দরী ... আমি বহুক্ষণ সেদিন ওর দিকে তাকিয়েছিলাম, ওকে আগেও দেখেছি, কিন্তু সেদিনের সেই অবাক পবিত্রমুখ, তা মূর্তি গড়িয়ে পুজো করার মতন। আমি ওকে বলেছিলাম, খুকু, তুমি একটা ফুল নেবে? ও বলেছিল, আমার নাম খুকু নয়, আমার নাম যমুনা। আমায় চিনতে পারলেন না? আমি বরুণের বোন।

স্থির চোখে তাকিয়ে দেখলুম, লীলা শাড়ি পরেছে, তবু যমুনার মুখ এখনো পবিত্র সরল। ঝরনার জলের মত ঝকঝকে শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই যমুনার সঙ্গে গল্পের নায়কের বারবার দেখা হয়ে যায়। তাকে কাছে না পেলে জীবন ব্যর্থ মনে হয়।

মুহূর্তে দপ করে রাগ জ্বলে উঠলো আমার শরীরে। মাথায় ছলাৎ করে রক্ত চলে এলো। আমি কঠিন মুখে ভস্ম করার চোখে রাস্তার দিকে চেয়ে মনে মনে বললুম, যমুনাকে ফিরিয়ে এনে দাও! যমুনাকে আমি দেখতে চাই একবার, এখুনি,

যমুনাকে দাও! নইলে আমি সর্বনাশ কাণ্ড বাধাবো, আমি ট্রামের লাইন উপড়ে ফেলবো, ছিঁড়ে ফেলবো টেলিগ্রাফের তার, মাঝ রাস্তায় আগুন জ্বালাবো। কোথায় যমুনা? দাও!

স্পষ্ট বুঝতে পারছি প্রবেশ করছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর উপন্যাসের অন্তর্মহলে, দরজা খুলে যাচ্ছে তাঁর ভাষাজগতের—যে ভাষাদেশ তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন, যেখানে তিনি স্বপ্নস্রষ্টা, জীবনস্বপ্নের লিপিকার। নারী তাঁর কাছে প্রেরণা ও অনুসন্ধানযোগ্য কারণ কবিতা ও উপন্যাস লেখার জন্য স্বপ্নজগতে প্রবেশে, নারীরাই লেখকের প্রিয়তম সিঁড়ি।

যমুনার সঙ্গে উপন্যাসের নায়কের বারবার দেখা হয়েছে। পথে দাঁড়িয়ে নায়ক যমুনার জন্য প্রতীক্ষা করেছে, দু-জনে বেড়াতে গেছে, তবু মনে হয় এই উদাসীন নায়ক কখনো যমুনাকে পাওয়ার জন্য তেমনভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। শেষপর্যন্ত যমুনা অন্য যুবকের অঙ্কারূঢ় হয়। একেবারে শেষে এই উপন্যাসে যমুনার উল্লেখ পুনরাবৃত্ত হয়েছে। 'যমুনার সঙ্গে দেখা হল, সঙ্গে তার স্বামী।' এই সাক্ষাৎ দমদম এয়ারপোর্টে। সেখানেও নায়ক তাকে স্নেহমিশ্রিত এক ক্ষমাশীল ঔদাসীন্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। যমুনার দিদি সরস্বতী এ-উপন্যাসে সহোদরার বৈপরীত্যে স্থাপিত।

এই যমুনার নামোল্লেখ পাচ্ছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর কবিতায়—

যমুনা, আমার হাত ধরো। স্বর্গে যাবো।
...
তুমি শুধু আমার যমুনা।
হাত ধরো, স্বরবৃত্ত পদক্ষেপে নাচ হোক, লজ্জিত জীবন
পৃথিবীতে বড় বেশী দুঃখ আমি পেয়ে গেছি, অবিশ্বাসে
আমি খুনী, আমি পাতাল শহরে জালিয়াত, আমি অরণ্যের
পলাতক, মাংসের দোকানে ঋণী, উৎসব ভাঙার ছদ্মবেশী
গুপ্তচর!
তবুও দ্বিধায় আমি ভুলিনি স্বর্গের পথ, যে-রকম প্রাক্তন স্বদেশ।
তুমি তো জানো না কিছু, না প্রেম, না নিচু স্বর্গ, না জানাই ভালো
তুমিই কিশোরী নদী, বিস্মৃতির স্রোত, বিকালের পুরস্কার...

আয় খুকি, স্বর্গের বাগানে আজ ছুটোছুটি করি।

('প্রবাসের শেষে', *বন্দী, জেগে আছো*)

কবিতার মেয়ে ও উপন্যাসের মেয়ে এখানে মিলেমিশে গেছে। 'আত্মপ্রকাশ' স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস। আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন, 'আমার

কবিতাগুলি অতিশয় ব্যক্তিগত বা স্বীকারোক্তিমূলক।' (*সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী)। ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস কল্পনার সঙ্গে মিলনে শিল্প হয়ে উঠেছে।

'আত্মপ্রকাশ'-এ আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ নারীচরিত্র আছে, তার নাম মনীষা। এই নামটিও সুনীল-সাহিত্যের অন্যত্র পাওয়া গেছে। 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসের নায়ক সুনীল-এর সঙ্গে মেসে এক ঘরে থাকা ব্রজেশ্বরদা বলেছিলেন—

> ভালোবাসাই পৃথিবীর সব শূন্যতা পূরণ করে দিতে পারে...।

গল্পকথকও চেষ্টা করেছিল ভালোবাসার দিকে মুখ ফেরাতে কিন্তু পারেনি। মনীষা সম্পর্কে লেখকের অনুভূতি এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—

> বিয়ে তো আমি অনেক আগেই মনীষাকে করতে চেয়েছিলাম।

মনীষা আসলে প্রেমের খেলার সব নিয়মই ভেঙে দেওয়ার মতো মেয়ে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিসমূহের বিন্যাসে এই তথ্য প্রতিষ্ঠা পায়।

> হাতের মুঠোয় আমলকীর মতন গোটা পৃথিবীর দিকেই আমি অভয় চোখে তাকাতে পারি, এমন অহঙ্কারও হয়েছিল আমার। সেই অহঙ্কারেরই তাপে ভেবেছিলাম মনীষাকে জয় করতে পারবো। কিন্তু মনীষা আমাকে কোনো সুযোগই দেয় নি।
>
> মনীষা খুব সিল্কের শাড়ি পরতে ভালবাসে, যখনই ওকে দেখেছি সিল্কের শাড়ি পরা, সন্ধেবেলা ও হয়তো তখন কোথাও বেরুতে যাচ্ছে বা বাইরে থেকে ফিরে আসছে। এখনও মনীষার কথা ভাবলেই আমার চোখে ভাসে ওর মেরুন-রঙা সিল্কের শাড়ি পরা মূর্তি।
>
> ... মনীষার স্বভাব অনেকটা স্বাধীন। যখন খুশি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, যখন খুশি আসে।
>
> এমন সুন্দর, এমন বুদ্ধিমতী, এমন নিষ্ঠুর মেয়ে আমি আর কখনো দেখি নি।
>
> আমার কাছ ঘেঁষে মনীষা বসেছিল, ওর শরীর থেকে সুন্দর ঘ্রাণ ভেসে আসছে, মেরুন-রঙা সিল্কে ওর শরীরের রেখাগুলো আরও মসৃণ, আমার খুব ইচ্ছে হলো বিশ্ববিজয়ী হবো।
>
> মনীষা আমার হাতটা ছুঁতেই আমি ওকে টান মেরে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলুম। —ইস্, অত সহজ নয়! মনীষা হাসতে হাসতে হাত ছাড়িয়ে নিল।
>
> মনীষার সঙ্গে যদি আমার পরিচয় না হতো, তা হলে অনেক আগেই হয়তো আমি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারতুম, ফিরে আসতে পারতুম সুস্থতার

দিকে। অমন পাপহীন উজ্জ্বল মেয়ে মনীষা, কিন্তু ওই আমাকে ঠেলে দিল আরও গম্ভীর অন্ধকারের দিকে।

কিন্তু ব্যর্থ প্রেমও তো নয়, মনীষার সঙ্গে আমার প্রেমে পড়াই যে হলো না। মনীষার সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে, তখন ও কত আপন, একেবারে বুকের কাছ ঘেঁষে এসে কথা বলেছে।

... মনীষাকে পাবার ইচ্ছে তীব্র হয়ে দেখা দেয়। মনীষাকে আমার খুবই দরকার প্রেমে, অপ্রেমে বা শরীরে। ... মনীষাকে যে আমি চাই — একথাটাই বলার সুযোগ ও আমাকে দিল না কিছুতেই।

একা কোথাও মনীষার সঙ্গে দেখা হয় না। আমি যখন একা থাকি, মনীষা তখন পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দোলের দিন রং দেবার আবেগে আমি মনীষার বুক ছুঁয়ে দিলাম, মুখ ও গলা ছাড়িয়ে আমার হাত মুহূর্তে ঢুকে গেল ওর ব্লাউজের মধ্যে, গরম, পরিপূর্ণ দুই বুক—তবু মনীষা থমকে তাকালো না আমার মুখের দিকে, অথবা ভর্ৎসনা ও ধিক্কার দিল না, নিমেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পরমুহূর্তে ফিরে এসে এক গাদা কয়লার গুঁড়ো আমার মুখে মাখিয়ে ভুত সাজিয়ে দিল। বললো, এবার কেমন লাগে?

মনীষা উপাখ্যানের নানা খণ্ড অংশ উদ্ধৃতি সহকারে বিবৃত করলাম। ভাব ও ভাষার, প্রেম ও যৌনতার, স্বপ্ন ও মনস্তত্ত্বের এক অপূর্ব সমাবেশ এখানে।

এ প্রেম-কাহিনির না ফুরোনো সমাপতনটুকুও বিবৃত করছি—

নিজেকে তখন একটা তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর আবর্জনার মতো মনে হয়। এই একটি সামান্য মেয়ের মন স্পর্শ করার আমার ক্ষমতা নেই।

এই একটা ব্যাপারে আমি যত বেশি নিঃসঙ্গ হতে লাগলুম, ততই মনীষার জন্য আমার ব্যাকুলতা বাড়তে লাগলো।

আমি পাশাপাশি চোখে মনীষার গ্রীবা ও স্তন এবং উরুর দু'ভাঁজ দেখে নিয়ে ইচ্ছে করে একটু পিছিয়ে এসে ওর পশ্চাৎ শরীরটাতেও চোখ বুলিয়ে নিই। আর যাই হোক, মনীষাকে ত্রুটিহীন রূপসী বলা যাবে না...।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললুম, মনীষা, মাঠের মধ্যে গিয়ে একটু বসবে?
—না। দেরি করতে পারবো না আর। এবার ফিরতে হবে, চলুন বাসে উঠি।

...আমি তোমাকে কাছে পেতে চাই—
—এই তো কাছে আছি, আরও কাছে আসবো? এই তো এলাম, এবার বাড়ি চলুন লক্ষ্মীটি।

আমার ধৈর্যের সেখানেই শেষ। আমার ভালো হওয়ার চেষ্টার সেখানেই শেষ। আমার পথ বদলাবার চেষ্টারও সেখানেই শেষ। প্রায় একটা হ্যাঁচকা টানে আমি মনীষাকে টেনে এনেছিলাম আমার বুকের ওপরে।

... মনীষা প্রথমে ঠোঁট খুলতে চায় নি, কিন্তু আমি বুলডোজার চালানোর মতো দুই ঠোঁটে, যতক্ষণ না আমার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল—ততক্ষণ চুমু খেয়েছিলাম। দেখা যাক, এই ভাষা ও বোঝে কিনা।

ওর নরম হাতের চাপে আমার ঠোঁট বন্ধ। কাতর গলায় বললো, আপনাকে আমি আর পাগলামি করতে দেবো না। দেখতেন, পরে এজন্য আপনার নিজেরই কষ্ট হবে।

... মনীষার ফর্সা গালে আমি থাপ্পড় কষিয়েছি। এত জোরে মারার হয়তো আমার ইচ্ছে ছিল না, ... আমি খর চোখে মনীষার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মনীষাও আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। একটুও রাগ নেই মুখে, ... আস্তে আস্তে বললো, আপনি সত্যিই পাগল হয়ে গেলেন নাকি? ... সত্যি খুব লেগেছে।

কী ধাতুতে গড়া এ জিনিস? মেয়ে না ডাকিনী? এই চব্বিশ বছরের শরীরবাহী জীবন নিয়ে ও কি চায়? মনীষার শরীর তো ঠাণ্ডা নয়, আমি ওর বুক ছুঁয়ে দেখেছি, শীতকালের বিড়ালের মতন ওর বুক নরম ও গরম।

মনীষার সঙ্গে তার পরেও দেখা হয়েছে, কোনো অভিযোগ করে নি, ব্যবহার আড়ষ্ট করে নি, কিন্তু সামান্য দূরত্ব রেখেছে।

কিন্তু মনীষার সঙ্গে একা দেখা করার ইচ্ছে আমার আর হয় নি।

মনীষার সঙ্গে গল্পকথক অথবা নায়কের এই প্রেমকাহিনি অসম্পূর্ণতার বেদনায় ভরা। মনীষা সত্যিই এক রহস্যময়ী নারী, যাকে বোঝার আশা জলাঞ্জলি দিতে হয়। 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসে আরো একটি প্রেমের কাহিনি আছে। একে প্রায় কিশোর প্রেমের কাহিনি বলা যেতে পারে।

বি. এ. পরীক্ষার পরের ছুটিতে আমি বহরমপুরে গিয়ে দেড় মাস ছিলাম, সেই সময় গায়ত্রীর সঙ্গে আমার নতুন করে বন্ধুত্ব হয়। ... গায়ত্রীর মধ্যে আমি আবিষ্কার করলুম এক রহস্যময়ীকে। লম্বা-টান চেহারা, মাথায় প্রায় আমার সমান, সুন্দর স্বাস্থ্য।

গায়ত্রীও বি এ পরীক্ষা দিয়েছে এবং সে নায়ক সুনীলকে সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* পড়তে দিয়েছিল। গায়ত্রীর সঙ্গে গল্পকথক রোজ বিকেলে বেড়াতে যেত। নায়কের

বাবা একদিন দু-জনকে পথে দেখলেন, অত্যন্ত রক্ষণশীল তিনি, গায়ত্রীর বাড়িতে ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন এবং সে মত হয়তো গৃহীতও হত। গায়ত্রী অবশ্য বেঁকে বসল, সে আরো পড়ে বিলেত যেতে চায়। বাবার প্রতি বিরক্তি ও ঘৃণায় মন ভরে উঠল নায়কের। স্বাধীন সত্তা নিয়ে নায়ক সুনীল প্রেমজনিত সঙ্গই চেয়েছিল, বিবাহবন্ধনে এই অল্পবয়সেই জড়াতে চায়নি। বহরমপুর ছেড়ে সে চলে আসে, বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগাযোগও রাখে না।

এই 'গায়ত্রী' নামটি আবার পাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর *আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি* কাব্যগ্রন্থের 'সকল ছন্দের মধ্যে আমিই গায়ত্রী' নামের কবিতায়—

> গায়ত্রীর মতো নারী শুয়ে আছে, বিশাল জঘন মেলে...

'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসে তিনটি নারী চরিত্রের মধ্যে যমুনার সঙ্গে নায়ক সুনীলের সম্পর্ক-সম্ভাবনা থাকলেও শেষপর্যন্ত অন্য পুরুষের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এ-ব্যাপারে বোঝা যায় সে তার পরিবারের নির্দেশই মেনে নিয়েছে। গায়ত্রীও একই পথে গেছে। কিন্তু তিন জনের মধ্যে মনীষাকেই যথার্থ রহস্যময়ী ও বহুপাপড়ি গোলাপের মতো মনে হয়। তার চলনবলন, ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা সব প্রায় গীতিকবিতার মতো, কিন্তু এই গীতিকবিতা শেষে বেদনাগাথা হয়ে উঠেছে। নায়কের সঙ্গে মনীষা একই সঙ্গে কেন প্রেমিকা ও সন্ন্যাসিনীর মতো আচরণ করেছে তা বোঝা গেল না। বিংশ শতকে সব বাঙালি কবিরই প্রিয় এক মহাকবি বলে গেছেন—

> প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু কিছুক্ষণ
> প্রেমের বেদনা থাকে সারাটি জীবন।

মনীষা কি গল্পকথকের জীবনে এই তত্ত্বটি প্রমাণ করবার জন্যেই আবির্ভূত হয়েছিল। দেহগত প্রেমের উষ্ণতা কি তার মধ্যে ছিল না। এ-রহস্য নিয়ে প্রশ্ন করা যায় কিন্তু কোনো উত্তর মেলে না।

> Simple lip kissing is so commonly accepted that it has a minimum of erotic significance at this level. The college male may expect to kiss his date the first time they go out together.
>
> (*Sexual Behaviour in the Human Male*, Alfred Kinsey Wardell B. Pomeroy Clyde E. Martin, W. B. Saunders Company, Philadelphia and London, 1948)

এই বিখ্যাত কিনসে রিপোর্ট বলছে, এই পর্যায়ে শিক্ষিত শ্রেণিতে ওষ্ঠচুম্বন এত সহজে গৃহীত হয় যে এর মধ্যে যৌনতাৎপর্য ন্যূনতমই থাকে। কলেজের নবীন ছাত্র প্রথম দিনই তার প্রেমিকার সঙ্গে একান্ত ভ্রমণে বেরিয়ে তাকে চুম্বন করবে এটা প্রত্যাশিত। মনীষা কিন্তু তরুণ নায়ক সুনীলকে তার ঠোঁটে চুমু খাওয়ার বিনিময়ে কোনো সাগ্রহ

চুম্বন প্রতিদান হিসেবে দেয়নি। তবে কী তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে ফ্রয়েডীয় অর্থে নিউরোসিস ছিল? কিন্তু সে তো স্বাধীন বিচরণকারী ও অনেক বিষয়েই স্বতঃস্ফূর্ত।

অতএব নায়কের 'লিবিডো' অথবা তীব্র মিলন-আকাঙ্ক্ষার মরুভূমিতে দিকহারা হয়ে পড়েছে। এই 'লিবিডো'-র সংজ্ঞা দিয়েছেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড —

> We have defined the concept of 'libido' as a quantitatively variable force which could serve as a measure of processes and transformations occuring in the field of sexual excitation.
>
> ('On Sexuality', Sigmund Freud,
> The Pelican Freud Library, Vol. 7)

লিবিডো এক যৌন-উত্তেজনার আধার অথবা যৌনকামনা। মনীষার দেহমনের রহস্য না-জানায় নায়কের মনে একা অপরিসীম ক্রোধ জেগে উঠেছিল, বিচূর্ণ করে ফেলতে ইচ্ছে করেছিল নিজেকে। কিন্তু জীবনতৃষ্ণা ধীরে ধীরে তাকে শুশ্রূষার পথে নিয়ে গেছে।

নায়কের সঙ্গে তার বাবার সম্পর্কটাও মনস্তত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী 'Love-hate relation'—একই সঙ্গে প্রীতি ও অপ্রীতির সম্পর্ক।

> খুব ছেলেবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে আমার একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। ...বাড়ির ছোট ছেলে হিসেবে বাবার আদর পাবার বদলে আমি ওঁকে এড়িয়েই চলতুম। বাবা এমনিতেই বেশ গম্ভীর, তা ছাড়া কোনো ব্যাপারেই নিজস্ব মত বদলাতে চাইতেন না বলে, আমারও [আমরাও] কথা বলার তেমন উৎসাহ পাই নি। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে রথের মেলা দেখতে যাবো কিনা—বাবাকে জিজ্ঞেস করলে উনি শুধু সংক্ষিপ্তভাবে বলতেন, না, তারপরই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতেন—যেন এ সম্পর্কে আর কোনো কথাই চলে না। ... ছেলেবেলায় বাবার এই গাম্ভীর্য ও কঠিন স্বভাবের জন্য বাবাকে বেশ ভয় ও ভক্তি করতুম ... নিজেরা নির্যাতিত হলেও বাবাকে মনে করতুম মহাপুরুষ। ক্রমে বাবার নির্বুদ্ধিতা ও গোয়ার্তুমিগুলো একটু একটু করে চোখে পড়ে। ... দাদা কোনোদিন বাবার কোনো কথার প্রতিবাদ করে নি। কিন্তু আমি ক্রমশ তেরিয়া হয়ে উঠলুম।

অর্ধেক জীবন নামক আত্মজীবনীতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পিতৃস্মৃতি লিখেছেন। চার ভাইবোনের মধ্যে সুনীলই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ।

> ছুটির দিনগুলির সকালে বাবা বাড়িতে থাকতেন। তিনি সকালে ও দুপুরে স্কুলে পড়ান, তারপর বিকেলে কোচিং ক্লাস, আবার সন্ধের পর টিউশানি, সংসার চালাবার জন্য, আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় তিনি দিনে প্রায় ষোলো-

সতেরো ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন।... আমাকে ভর্ৎসনা করে বলতেন, লেখাপড়া করবি না, বড় হয়ে চায়ের দোকানে বয় হবি!

ধীরে ধীরে পিতা-পুত্রের ভূমিকাও বদলে যায়। টাউন স্কুলের শিক্ষক পিতা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুও বর্ণিত *অর্ধেক জীবন*-এ।

... রাস্তা পার হবার সময় বাবা শক্তভাবে আমার হাত ধরে রাখতেন, তাঁর মুঠি দৃঢ়, ব্যক্তিত্বপূর্ণ। ...এখন বদলে গেছে ভূমিকা, এখন পুত্রই হাত ধরে রাস্তা পার করাচ্ছে পিতাকে...।

সেইদিন সন্ধের পর পূর্ব বাংলার মাইজপাড়া গ্রামের কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, টাউন স্কুলের শিক্ষক, সংসারযুদ্ধে বিধ্বস্ত সৈনিকের মতন শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করলেন মৃত্যুর কাছে। তাঁর বয়েস তখন একান্ন। জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বয়েস সাতাশ, অন্য ছেলেমেয়েরা তখনও ছাত্রছাত্রী। তাঁর স্ত্রী মীরার শরীরে-মনে তখনও প্রৌঢ়ত্বের ছোঁয়া লাগেনি।

'স্মৃতির শহর ২১' কবিতায় এই পিতৃপ্রসঙ্গ অসাধারণভাবে উপস্থাপনা করেছেন কবি—

বাবার হাত শক্ত করে চেপে ধরে নিজের চোখের চেয়েও
অনেক বড় চোখ মেলে
পা দিয়েছিলাম এই শহরের বাঁধানো রাস্তায়...

তারপর ওই একই কবিতায় অল্প পরেই পাই—

একদিন আমি নিজেই ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম বাবার হাত
বাবা আমাকে ধরতে এসেছেন
আমি আড়ালে লুকিয়েছি
বাবা আমাকে রাস্তা চেনাতে গেলে
আমি ইচ্ছে করে গেছি ভুল রাস্তায়
তাঁর উৎকণ্ঠার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে আমার ভয় ভাঙা
তাঁর বাৎসল্যকে ঠকিয়েছে আমার সব অজানা অঙ্কুর
তিনি বারবার আমাকে কঠিন শাস্তি দিলে আমি তাঁকে
শাস্তি দিয়েছি কঠিনতর
আমি অনেক দূরে সরে গেছি..

লেখক ও তার পিতার সম্পর্ক ফ্রয়েড বর্ণিত 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়—

> The reason for this that the deepest and most invariable motive for estrangement, especially between two people of the same sex, had already made itself felt in early Childhood... we refer to them as the 'Oedipus Complex', because the legend of Oedipus realizes, with only a slight softening, the two extreme wishes that arises from the son's situation—to kill his father and take his mother to wife.'
>
> (Introductory Lectures on Psychoanalysis,
> The Pelican Freud Library, Vol. 1)

শৈশবেই পুরুষ-শিশু পিতাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে, সে পিতাকে উৎসাদিত করে নিজেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতে চায় কারণ মা হচ্ছে তার প্রথম প্রেমিকা। গ্রিক নাটক 'Rex Oedipus' থেকে ভাববস্তু অবলম্বনে এরই নাম ফ্রয়েড দিয়েছেন 'ইডিপাস কমপ্লেক্স'। এ-ধরনের complex থেকে জাত অপরাধবোধকে শিশু repress বা অবদমন করতে চায়। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হয়ে সে মাতৃবন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং শেষপর্যন্ত বাবার ত্রুটিগুলো মেনে নেয় ও তাকে কিছুটা ক্ষমাশীলতার সঙ্গে দেখে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ'-এর নায়ক ও তার বাবার মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক, লেখকের বাস্তবজীবনের পিতাপুত্র সম্পর্ক কিছুটা যার ভিত্তি, তাকে এভাবেই ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

'আত্মপ্রকাশ' স্বল্পাবয়ব উপন্যাস হলেও এতে একটা সমান্তরাল উপকাহিনি আছে। তা হচ্ছে বীণা ও তার দিদি সাধনা ওরফে নূরজাহান বেগমের কাহিনি। নায়ক ও তার বন্ধুরা আত্ম-উপলব্ধির সন্ধানে ও অভিজ্ঞতার জন্য যে অন্ধকার জগতে ঘোরাঘুরি করেছে—'কৃত্তিবাস' কবিগোষ্ঠীর জীবনযাপনের সঙ্গে যার সাদৃশ্য—সেই জগৎ থেকেই উঠে এসেছে বীণার মতো রমণীরা। তারা লেখকের মানবিক সহানুভূতির রঙে আঁকা। এই নায়ক রূপোপজীবিনীদের কাছে যেত দেহ সম্পর্কের জন্য নয়, নিছক মানসিক সংসর্গের জন্য, এ-কথা সে নিজেই বারবার বলেছে।

নিরুদ্দিষ্ট বন্ধু শেখরকে বীণার ওখানেই আবিষ্কার করা যায়। বীণা, বীণার দিদি সাধনা (নূরজাহান) যে পরে বাংলাদেশে গিয়ে অভিনেত্রী হিসেবে নাম করেছে, বীণার বাবু চিন্তামণি রক্ষিত, নূরজাহানের সঙ্গী আবদুল হালিম, নূরজাহান অথবা সাধনার কলকাতানিবাসী প্রথম স্বামীর ঔরসজাত বালকপুত্র, যাকে পাওয়ার জন্য সে ঝুঁকি নিয়ে কলকাতায় এসেছে, সকলেই দু-একটি রেখার আঁচড়ে ফুটে উঠেছে। অনুষঙ্গে শেখর তার পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে, অবিনাশ তার প্রচণ্ডতা নিয়ে বেশ চিত্তাকর্ষক। এই বন্ধুদের সঙ্গে বীণার আবাসে এলএসডি সেবনের বৃত্তান্তও পাচ্ছি। এসবই 'আত্মপ্রকাশ'-এ এনেছে নানা রঙের অনুরঞ্জনা। এলএসডি খেলে এক অদ্ভুত মায়াজগতের আবির্ভাব হয়, পরিস্থিতি অনেকসময় বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। অ্যালেন

গিনসবার্গ এলএসডি অর্থাৎ 'লাইসারজিক অ্যাসিড' নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন—

> আমার অস্তিত্ব থেকে পালানোর চেষ্টা করছি...
> আমি বমি করি, আমি একটা ভাবসমাধির মধ্যে, আমার শরীর মূর্ছা-অধিকৃত
> আমার পেট গুঁড়ি মেরে চলে, মুখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, আমি এখানে নরকে...
> ('Lysargic Acid', অনুবাদ: লেখককৃত)

যাই হোক 'আত্মপ্রকাশ'-এ নূরজাহানের মাতৃসত্তার যে সকরুণ ছবি সুনীল বুনে দিয়েছেন তা মনকে ছুঁয়ে যায়। 'নূরজাহান ব্যাকুলভাবে ছটফট করতে লাগল, বারবার হাত ছাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে ছেলেটাকে'—এসব লাইন মনে পড়ে। ছেলে কিন্তু বহু বছর পর মা-কে একেবারে চিনতে পারল না ও প্রত্যাখ্যান করল। বীণা, সাধনা, দেশভাগের পর উদ্বাস্তু এইসব মেয়েদের দুঃখকাহিনি 'আত্মপ্রকাশ'কে একটা অন্যরকম মাত্রা দিয়েছে।

'আত্মপ্রকাশ'-এ স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের কথাও রয়েছে।

> সেদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে আমি নানান দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। আবছা আবছা অস্পষ্ট ঘুম বারবার ভেঙে যাচ্ছে স্বপ্নে, আমি বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুচ্ছি, তখন আবার আর একটা স্বপ্ন, পূর্ব বাংলার গ্রামের যে বিশাল বটগাছটায় তক্ষক ডাকতো—সেটাতে দড়ি বেঁধে কে যেন আত্মহত্যা করেছে... মনীষা হাসতে হাসতে শেখরের তাস ছুঁয়ে দিল, আমি অরুণকে বললুম, সত্যি কোনো পাগলা গারদেই সিট পাওয়া যাচ্ছে না, মনীষাকে নিয়ে তো খুব মুশকিল হলো...।

বস্তুত 'আত্মপ্রকাশ'-এ আগাগোড়াই একটা স্বপ্নের পরিবেশ আছে কারণ সেই দিনগুলি ছিল আত্মনির্মাণের সময়, ছিল স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন লেখার সময়। আর কে না জানে সংকেতশিল্প ও অবচেতনার শিল্পের যে পতাকা, তাতে 'স্বপ্ন' নামক দ্ব্যক্ষর শব্দটিই তো বড়ো বড়ো করে লেখা। স্বপ্নের অর্থানুসন্ধান করেছিলেন মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড—

> ... I shall demonstrate that there is a psychological technique which makes it possible to interpret dreams, and that on the application of this technique, every dream will reveal itself as a psychological structure, full of significance, and one which may be assigned to a specific place in the psychic activities of the waking state.'
>
> (The Interpretation of Dreams, The Basic writings of Sigmund Freud, The Modern Library, New York)

মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে স্বপ্ন-বিশ্লেষণ সম্ভব। জাগ্রত অবস্থার যাবতীয় মানসিক অনুভূতির

প্রতিফলন ধরা পড়ে এই স্বপ্নের মধ্যে। স্বপ্ন হচ্ছে ইচ্ছাপূরণ। যে-স্বপ্নের ভাববস্তু বেদনাদায়ক, মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে বোঝা যায় সেখানেও রয়েছে ইচ্ছাপূরণ—

> Even dreams with a painful content are to be analysed as wish-fulfilments. (তদেব)

অতএব নায়কের দুঃস্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে তার মনের ভিতর অবদমিত আত্মহননের বীজের যেমন সন্ধান পাওয়া যায় তেমনই পাওয়া যায় প্রিয়তমাকে পাগলিনী হিসেবে দেখার বাসনা কারণ তা হলে ওই নারী আপন ইচ্ছা হারিয়ে প্রেমিকের পরিচর্যা ও ইচ্ছার অধীন হয়ে উঠবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'আত্মপ্রকাশ'-এর এক জায়গায় বাদুড়ের উল্লেখ করেছেন। এই বাদুড় অবশ্য সংকেতের মতো। জীবনানন্দ দাশ-এর মতো এই লেখক পশুপাখিদের তাঁর সাহিত্যে সংকেত বা চিত্রকল্পরূপে বেশি ব্যবহার করেননি। এই বাদুড় প্রসঙ্গ বেশ চিত্তাকর্ষক।

> ... খুব ছেলেবেলায় আমি একবার একটা বাদুড় ধরেছিলাম, সেটার কথা মনে পড়ে [।] আমাদের রান্নাঘরের পিছনে একটা গাবগাছে বাদুড় থাকতো, একদিন চুপি চুপি গাছে উঠে একটা বাদুড়ের ডানা চেপে ধরেছিলাম। আশ্চর্য, বাদুড়টা কয়েকবার ঝটপট করেই মরে গেল, বাদুড়ের চেহারা দেখেও এমন ঘেন্না লাগছিল যে, আমি ওটাকে বাঁশবনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু বাদুড়টার ডানা থেকে কাজলের মতো তেলতেলে কালো রং লেগে গিয়েছিল আমার হাতে, বারবার সাবান আর গেরিমাটি দিয়ে ধুয়েও হাত থেকে সেই তেলতেলে ভাব ওঠে নি। সাতদিন পর্যন্ত সেই হাত দিয়ে কিছু খেতে গেলেই দুর্গন্ধ পেয়ে বমি আসতো। এখনো, সেই দিনটার কথা মনে পড়লেই হাতের সেই তেলতেলে ভাবটা যেন টের পাই, বমি ঠেলে আসে।

জীববিজ্ঞানীরা বাদুড়ের বিবরণ দিয়েছেন—

> There are 160 species of fruitbats; 60 of these are known as flying foxes and not all eat fruits, so their common name is misleading.
> (The New International Wild Life Encyclopedia : Vol 6, Purnell Reference Books)

১৬০ জাতের ফলভুক বাদুড় আছে। এদের মধ্যে ৬০টি 'ফ্লাইং ফক্স' নামে অভিহিত, কিন্তু সবাই ফল খায় না।

'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসে একদিকে যেমন দুঃখ, হতাশা, নেশা, আত্মনির্যাতন ও অন্ধকার জগতে বিচরণের ছবি আছে তেমনই ওই জগৎ থেকে আনন্দ, আশা, স্বপ্ন, প্রেম ও আলোর জগতে উত্তরণের সাধনাও আছে। একেই বলা যেতে পারে প্রতিভার

আত্মপ্রকাশ অথবা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। গল্পকথক নিজেই বলেছেন—

> ক্রমশ এ কথাও বুঝতে পারছিলুম, এবার ফিরতে হবে। এইসব চোর-গুণ্ডা-জুয়াড়ি-মাতাল-মজুর-বেশ্যা-দালাল—এদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে একঘেয়ে লাগতে লাগল আস্তে আস্তে।... এও সেই বাদুড় ধরার মতন, একবার ছুঁলে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নয়।... পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত হবার ভয়েই আমি নিজেকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা শুরু করলুম।

আত্ম-অনুসন্ধানের আত্মনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বন্ধুদের সঙ্গও মাঝেমাঝে পরিত্যাজ্য মনে হল—

> শেখর আর আমি এক সঙ্গে জীবন শুরু করেছিলুম, কিন্তু সারা জীবন এক সঙ্গে চলতে হবে তার কোনো মানে নেই।

'আত্মপ্রকাশ' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস হলেও এর মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রতিভার সব চিহ্নই আছে। বস্তুত, কাফ্‌কার 'The Outsider', 'The Trial' অথবা 'The Castle', সার্ত্র্-এর 'Nausea', জেমস জয়েস-এর 'A Portrait of the Artist as an Young Man', সল বেলো-র 'Seize the day' প্রভৃতি আধুনিক আত্ম-অনুসন্ধানী, বিদ্রোহমূলক উপন্যাসের কথা 'আত্মপ্রকাশ' পড়তে গেলে মনে আসবে। বিষয়বস্তু অথবা উপস্থাপনা হয়তো একটু অন্যরকম কিন্তু মূলে একটা সাযুজ্য আছে—অস্তিত্বের ভয়াবহ ভার ও সৌন্দর্যসন্ধানী মানুষের আত্মবিবিক্তির সাহিত্যিক বিবৃতি সব ক-টি উপন্যাসেই। সমরেশ বসু-র 'বিবর', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' প্রভৃতি উপন্যাসের নামও এ-প্রসঙ্গে বলা যায়।

'আত্মপ্রকাশ'-এর ভঙ্গি স্বীকারোক্তিমূলক। একে বলতে পারি রোমান্টিকতা মিশ্রিত আধুনিকতা—Romantic Modernism. লেখক অকপট সারল্যের সঙ্গে যা বলছেন তা প্রায় স্বগত ভাষণের মতো—তা শুধু তিনি শুনবেন, সহমর্মী শিল্পীমানস যাঁর সে শুনবে, দুর্মর প্রেমিকারাও শুনতে পারে কিন্তু এ-ছাড়া অন্য কেউ শুনলেই বিপদ। এ এক একান্ত মন্ত্রপূত গোপন জীবন—মেয়ের ভিতর যেমন মেয়ে এও তেমনি জীবনের মধ্যে জীবন। এই জীবনসারাৎসার বা জীবনস্বপ্নকে লেখক খুঁজতে চেয়েছিলেন, যেমন তিনি খুঁজেছিলেন মূল নারীকে। অদীক্ষিতজন, এ আত্মের গভীরে অবগাহন বা স্বীকারোক্তি বুঝতে পারবে না অথবা এর স্থূল কদর্থ করবে। এই নায়ক আসলে দেবদূতের মতন, সরল ও শিশুর মতো সুন্দর, পৃথিবীর যাবতীয় স্বপ্ন ও সৌন্দর্যকে ধারণক্ষম। সেই স্বপ্ন ও সৌন্দর্যকে যাপিত জীবনের ভিতর থেকেই একদিন ধরতে চেয়েছিলেন এক জাতশিল্পী, তাকে কেউ চিনতে পেরেছে কেউ চিনতে পারেনি। কবিতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাই তাঁর আত্মকথনে যথার্থই বলে গেছেন—

আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয় না
মৃত্যু হয় না
কেননা আমি অন্যরকম ভালোবাসার হীরের গয়না
শরীরে নিয়ে জন্মেছিলাম।
আমার কেউ নাম রাখেনি, তিনটে চারটে ছদ্মনামে
আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে...
('জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না': *আমার স্বপ্ন*)

স্বীকারোক্তির কথা উঠলে অবশ্য Rousseau-র *The Confessions* গ্রন্থটির কথা মনে পড়ে। রোমান্টিক আধুনিকতার সূত্রপাত এই বইটি থেকে এমনটাই ধরা হয়। নিজের সম্বন্ধে রুশো যা যা বলে গেছেন তার মধ্যে সত্য ও কল্পনার অনুপাত বোঝা দুরূহ। কিন্তু পাপ নয় পুণ্য নয় লেখক আমাদের অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষদের রক্তমাংসের ভিতরে অবস্থিত নিহিত বেদনাকেই খুঁজেছিলেন। কারণ তাকে না জানা গেলে মানবজন্মই বৃথা। রুশো বলেছিলেন—'Man is born free but everywhere he is in chains.' *The Confessions*-এর শুরুতেই ফরাসি-বিপ্লবের অন্যতম সূত্রধর জ্যঁ জাক রুশো বলছেন—'My purpose is to display to my kind a portrait in every way true to nature, and the man I shall portray will be myself... But I am made unlike any one I have ever met, I will even venture to say that I am like no one in the whole world. I may be, no better, but at least I am different. (The Confessions, Penguin Classics)। যে মানুষকে আমি আঁকব সে হচ্ছে স্বয়ং আমি, এবং এই সত্যি 'আমি'কেই আমি মানুষেরই কাছে প্রকাশ করব। কিন্তু এও বলছি, আমি সারা পৃথিবীতে অন্য কারোরই মতো নই। আমি হয়তো অন্যের চেয়ে অধিকতর ভালো নই, কিন্তু অন্য রকমের, এটা বলতে পারি। 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসে সেই অন্য রকমের এক লেখকসত্তাকেই পাওয়া যাচ্ছে—তা ভালো না মন্দ সে-কথা গৌণ।

অর্ধেক জীবন গ্রন্থের একেবারে শেষে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাস প্রসঙ্গে দু-একটা কথা বলেছেন। 'এ উপন্যাসের নায়ক বা প্রধান চরিত্রের নামও সুনীল... কিন্তু সুনীল নাম দিয়ে আমি বোঝাতেই চেয়েছি যে এটা আমার নিজের জীবনের ঘটনা। কিন্তু আত্মজীবনী নয়। প্রকৃত ঘটনা দিয়ে শুরু করলেও লেখার নিজস্ব একটা যুক্তিতে নতুন নতুন প্রসঙ্গের নির্মাণ হয়। বাস্তব জীবনী ছাড়াও মানুষের একটা আলাদা ভাবজীবনী থাকে, তা আলাদা হতে বাধ্য? আবার কখনও কখনও বাস্তবজীবন ও ভাবজীবনী মিলেমিশেও যায়...আত্মপ্রকাশের সুনীল কখনও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পরিবারের এক উদ্‌ভ্রান্ত যুবা, কখনও সে ক্রুদ্ধ, অস্থির যুবসমাজের প্রতিনিধি।' বস্তুত 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসে বাস্তব ও কল্পনার নিপুণ মিশ্রণ আছে, আধুনিক সাহিত্যে যুক্তি

অতিক্রমী কল্পনারই প্রাধান্য। বীণা-নূরজাহান বেগমের সংক্ষিপ্ত উপকাহিনিটি নিয়েও তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'পূর্ববঙ্গের এক অভিনেত্রীর ঘটনাটি অন্যের মুখে শোনা, আমার নিজের অভিজ্ঞতার নির্যাস নয় বলেই বেশ কৃত্রিম, এবং আত্মপ্রকাশ উপন্যাসে সেই অংশটিই সবচেয়ে দুর্বল।' তবু বলব উপকাহিনিটি প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে, উপন্যাসে ভাববৈচিত্র্য এনেছে।

'আত্মপ্রকাশ'-এর প্লট কিন্তু আধুনিক উপন্যাসের নিয়ম অনুযায়ী নিছক গল্প বলেনি। এর চরিত্রগুলির আকর্ষণ প্লটকে ছাপিয়ে যায়। সংলাপ নাটকীয়, ভাষায় ক্ষণে ক্ষণে লেগেছে কবিতাস্পর্শ, ভাব-ভূমিতে বসন্ত ঋতুর ব্যঞ্জনা, সময়পটে বিংশ শতক, স্থানপটে কলকাতা ও অল্প কিছুটা বহরমপুর। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে লেখকের জীবনদর্শন। নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি এক ভালোবাসার দৃষ্টিকোণ থেকে এ-উপন্যাসটি লেখা।

গ্রন্থপঞ্জি (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর রচনা)

আত্মপ্রকাশ (উপন্যাস)। *একা এবং কয়েকজন* (কাব্যগ্রন্থ)। *বন্দী জেগে আছো* (কাব্যগ্রন্থ) *আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি* (কাব্যগ্রন্থ)। *অর্ধেক জীবন* (আত্মজীবনী)। *স্মৃতির শহর* (কাব্যগ্রন্থ)। *আমার স্বপ্ন* (কাব্যগ্রন্থ)

ব্যবহৃত অন্যান্য গ্রন্থ ও রচনা

'The Waste Land' (Poem) : J. S. Eliot, Faber and Faber
'Sexual Behaviour in the Human Male' : Kinsey and others
'On Sexuality' : Sigmund Freud : The Pelican Freud, Library; vol 1.
'Introductory Lectures on Psychoanalysis', The Pelican Freud Library. Vol. 1
'Lysargic Acid' (Poem): Ginsberg.
'The Interpretation of Dreams' : The Basic writings of Sigmund Freud., Modern Library.
'The New International World life Encyclopedia' : Vol 6; Purnell Reference Books.
The Confession : Rousseau; Penguin Classics.

সম্পাদকীয় সংযোজন : *আত্মপ্রকাশ* উপন্যাসের যাবতীয় উদ্ধৃতি ১৯৬৬ সালে আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী। জীবনের প্রথম অর্ধের আত্মজীবনী *অর্ধেক জীবন*-এর উদ্ধৃতি ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী। যে কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি হল *একা এবং কয়েকজন, বন্দী জেগে আছো, আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি, আমার স্বপ্ন* ও *স্মৃতির শহর*। কবিতার উদ্ধৃতি আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত *কবিতাসমগ্র*-এর প্রথম খণ্ড (অক্টোবর ১৯৯৫) এবং তৃতীয় খণ্ড (ডিসেম্বর ২০০৩) অনুযায়ী। মূল রচনাটি ছাড়া যাবতীয় উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে উপরোক্ত সংস্করণগুলির বানান অপরিবর্তিত রাখা হল।